২৪-১১-১৬ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবার বাচ্চা হয়ে, কোনও ভুল-কার্য অবশ্যই করবে না। তোমরা ভুল করলে, তাতে তো বাবারই বদনাম হবে।"

প্রশ্ন :- জাগতিক দুনিয়ায় সব চাইতে বড় পরিবার কার ? আর তা কিভাবে ?

উত্তর :- শিববাবার পরিবারই জগতের সবচাইতে বড় পরিবার। ভক্তি-মার্গের সবাই যেমন কীর্তন করতে থাকে - তুমিই মাতা আবার পিতাও তুমি, অতএব তারাও তো পরিবারেরই অঙ্গ হলো, তাই না। কিন্তু যতক্ষণ না ওঁনার (শিববাবার) কোনও সাকার রূপের প্রকাশ ঘটে, সেই অবধি ওঁনার কোনও পরিবার থাকে না, যেহেতু আত্মারা তো তখন নিরাকারী অবস্থায় পরমধামে নিরাকারী বাবার সাথেই থাকে। যখন বাবা স্বয়ং এসে এনার (ব্রহ্মার) পার্থিব শরীরে প্রবেশ করেন, তারপরেই ওঁনার এই বিশাল পরিবার গঠিত হয়।

ওঁম্ শান্তি! বিশেষ করে ভারতে আর বাদবাকী সাধারণ দুনিয়ার লোকেরা তো এটাই জানে না যে, বেহদের বাবা নিবৃত্তি মার্গের নাকি (সাংসারিক) প্রবৃত্তি-মার্গের ? বাবা যখন আসেন, উঁনি তখন কেবল বাচ্চা-বাচ্চা বলে ডাকতে থাকেন, তাই তো ওঁনাকে আমরা বলে থাকি -ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা ত্বমেব ..... (তুমিই আমাদের মাতা আবার পিতাও তুমি), সেই হিসেবে তো ওঁনাকে গৃহস্থই বলা যাবে। যদিও একথা তো সবারই জানা আছে, প্রকৃত অর্থে শিববাবা তো নিরাকার। যদিও বা শিবের একটা আকার করা হয়, কিন্তু তখন তো ওঁনার কোনও সন্তান-সন্ততি হয় না। আসলে, তা হলো জগতের প্রতিটি আত্মাই ওনার বাচ্চা এবং সব বাচ্চাই একই প্রকারের। তাই লোকেরা ভাবে সবাই পরমাত্মা। আত্মা যেমন বিন্দু-স্বরূপ, পরমাত্মাও তেমনি বিন্দু-স্বরূপ। গৃহস্থরা তাই ওঁনার কীর্তন করে, ত্বমেব মাতা পিতা .....। নিবৃত্তি-মার্গের সন্ন্যাসীরা তো আবার বলে - পরমাত্মাই ব্রহ্ম। ওনারা কিন্তু বলেন না, ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা ত্বমেব। যেহেতু ওনারা ভিন্ন মার্গের। কিন্তু এটা তাদের মহা ভুল যে, তারা যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের সামনে বসে মহিমা ও কীর্তন করে, ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা ..... অথবা অন্য কোনও মহিমা। ভক্তি-মার্গে এমন অনেক স্তুতিই করা হয়। বাস্তবে পরমাত্মা তো আত্মাদেরই বাবা। তাই উত্তরাধিকার সূত্রে ওনার থেকে কিভাবে এবং কি প্রকারের আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়, তা জানতে হবে। তোমরা বাচ্চারা তা তো জানো, উঁনি একধারে যেমন বাবা, তেমনি তিনিই আবার দাদা (ঠাকুরদা)। এই একই ব্রহ্মা আবার রড়-মা, এবং প্রজাপিতাও অর্থাৎ যিনি সবারই পিতা। স্বয়ং ওনার মুখ দ্বারাই আমরা তা শুনে থাকি, "ওহে বাচ্চারা, আমিই তোমাদের ঈশ্বরীয় পিতা, আমাকেও আবার আসতে হয় এই সাংসারিক প্রবৃত্তি-মার্গে। তাই তো আমারও (ব্রহ্মার) যুগল (স্ত্রী) থাকে এবং বাচ্চাও থাকে। কিন্তু যখন সেই শরীরে আমি (শিব) প্রবেশ করি, তখন আমিও প্রবৃত্তি-মার্গের হয়ে যাই। আমাকেই সুপ্রীম-বাবা (পরম-পিতা), সুপ্রীম-টিচার, সুপ্রীম-গুরুও বলা হয়। আবার মুক্তিদাতা হিসাবে গুরু গাইডও বলে। একমাত্র এটাই সত্য, বাকী সবই মিথ্যা। ইংরাজী ভাষায় পরমাত্মাকে সত্য বলা হয়। আর সেই সত্য হলো, সত্য (বাবা) এসে সত্যের বাণী শোনান। যা অন্যেরা জানেই না। এমন কি তোমরা বা আমিও (ব্রহ্মা) তা জানতাম না। এটাই হলো নতুনত্ব। জ্ঞানের সাগর তো একজনই, যিনি সত্য-খন্ড (সত্যযুগ) স্থাপন করেন। কদাপি অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সেই সত্যের কথা জানিয়ে থাকবেন। তাই তো ওনার মহিমার এত কীর্তন করা হয়। সত্য-খন্ডকেই স্বর্গরাজ্য বলা হয়। অন্যেরা তাকে দেবতাদের সার্বভৌম রাজত্ব

বলে। বর্তমানের এই দুনিয়া তো পুরোনো দুনিয়া, যা তখন এক নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হবে। এই পুরোনো দুনিয়া তো আগুনেই ভস্মীভূত হবে। এটা তো সবার জানাই আছে যে, স্থাপনার সাথে সাথে বিনাশ কার্যও চলতে থাকে। তাই তো পরমাত্মাকে করন-করাবনহার বলা হয়। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনার কার্য করান। কিন্তু কিভাবে তা করান ? উনি স্বয়ং এসে তা অবগত করান। মানুষেরা এ সবের কিছুই জানতে পারে না। তারা কেবল এটুকুই বলে "করন-করাবনহার" অর্থাৎ তিনিই সব কিছু করিয়ে নেন। তোমরাও এখন এই নাটকের চিত্রপটকে জানতে পেরেছো। কলিযুগের শেষ আর সত্যযুগের শুরু ..... তাই এই সঙ্গমই সর্ব্বোত্তম উন্নত মানা উচিত। কলিযুগের ঠিক পরেই আসে সত্যযুগ। তারপর আবার ধীরে ধীরে নীচের দিকে পতনে নামতে হয়। একেই স্বর্গ আর নরক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের মৃত্যু হলে বলা হয়, স্বর্গবাসী হয়েছে। কোনও না কোনও সময়ে অবশ্যই তবে স্বর্গবাসী ছিল। বিশেষ ভাবে ভারতবাসীরাই এ ধরণের কথা বলে থাকে। যেহেতু ভারত-ই সবচাইতে প্রাচীন ভূখন্ড। তাই ভারতই সেই স্বর্গভূমি। এটা কত সহজ সরল ধারণা। কিন্তু নাটকের চিত্রপট অনুসারে, সেটাও বুঝতে পারে না লোকেরা। তাই তো বাবাকে নিজে এসে তা বোঝাতে হয়। তারাই আবার ডাকতে থাকে, বাবা তুমি আসো। তুমি আমাদের তোমার জ্ঞানের দানে জ্ঞানী বানাও। তুমি এসে পতিতদেরকে পবিত্র-পাবন বানাও। তারা আবার এও বলো, আমাদের দুঃখ হরণ করে সুখী বানাও। কিন্তু তাদের এটা জানা নেই যে, কিসের জ্ঞান দেবেন বা কোন প্রকারের সুখই বা দেবেন বাবা। এখন অবশ্য তোমরা বাচ্চারা তা জানতে পেরেছো উঁনিই তোমাদের বাবা আর এই সব কিছুই অবশ্যই ওনার রচনা। যেহেতু বাবা কথার অর্থই রচনাকার। বাচ্চারা যখন বাবা বলছে, তারা তো তবে ওনারই রচনা হয়। সেই রচনাকারও অবশ্য কারও দ্বারা রচিত হয়ে থাকবেন। উনিই আবার বাচ্চাদেরকে ধন-সম্পত্তির মালিক বানান। এ তো অতি সাধারণ কথা। বাবা বলেন, সেই কারণেই তো তোমরা আমার গুণ-কীর্তন করো- তুমিই মাতা আবার পিতাও তুমি। অতএব বাবাকে সবচেয়ে বড় গৃহস্থ বলা যায়। বাবা বলেন, তাই তো আমাকেই বলো -- মাতা-পিতা তুমি আসো, এসে আমাদের পবিত্র-পাবন বানাও। উনি যখন বাবা, তখন মা ছাড়া রচনা হবে কিভাবে। আর কিভাবেই বা বাবা তবে এখানকার এই রচনা রচবেন। যা কিন্তু একেবারেই নতুন ব্যাপার- তাই না! এই কথাগুলিই সাধারণ মানুষেরা তাদের বুদ্ধিতে রাখতে পারে না। আবার অন্যদিকে তারা পরমাত্মাকে ফাদার বলে ডাকতে থাকে। কিন্তু এখানে তো উঁনি মাতা ও পিতা দুক্ষেত্রেই একজন। তাই তা প্রবৃত্তি-মার্গই বলা যায়। কেবল বাবা বললেই ওঁনার কাছ থেকে মুক্তির বর্সা পাওয়া যায়, যিনি অবশ্য অনেক পরেই আসে। এ তো সবারই জানা আছে- খ্রীষ্টান ধর্মের পূর্বে ছিল বৌদ্ধ ধর্ম। আর তারও আগে ছিল ইসলামী ধর্ম। সিঁড়ির চিত্রে অন্য ধর্মকে দেখানো হয়নি, তাই তা গোলা অর্থাৎ সৃষ্টি-চক্রের পাশেই তা রাখা উচিত। এটা একটা পাঠশালা। পাঠশালায় তো আর একটাই মাত্র বই থাকে না। পাঠশালায় ম্যাপ/ভূচিত্রও রাখতে হয়। কিন্তু এই জাগতিক বিদ্যা তো আধ্যাত্মিক জগতের কাজে আসবে না। তবু ম্যাপের সাহায্যে মানুষেরা সহজেই বুঝতে পারবে। এই ধরণের ম্যাপ-গুলিই তোমাদেরও মুখ্য ম্যাপ। এত বিস্তারিত ভাবে বোঝানো সত্ত্বেও, তবুও অনেকে তা বুঝতেই পারে না, যারা একেবারে পাথর-বুদ্ধির বা নির্ব্বুদ্ধির হয়। বাবা এভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝান, মেলার প্রদর্শনীগুলিতে ত্রিমূর্ত্তির উপরেই প্রথমে বোঝাতে হবে। ইঁনি তোমাদের বাবা, উঁনি তোমাদের দাদা (ঠাকুরর্দা)। তাই কিভাবেই বা উনি তোমাদের জ্ঞান প্রদান করবেন ? বর্সাই বা দেবেন কি প্রকারে ? কেবল মাত্র ভারত-বাসীদেরই সেই বর্সার প্রাপ্তি ঘটে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় এবং তিন ধর্মের স্থাপনা করেন। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণের রচনা করান- এক বিশেষ যজ্ঞের সাহায্যে। যাকে বল হয় রুদ্র-জ্ঞান-যজ্ঞ। কিন্তু ভক্তি-মার্গের যেসব যজ্ঞ অনুষ্ঠান

হয়, তা শুরু হয় অনেক পরে। যেহেতু শুরুর প্রথম দিকে কেবল শিবেরই পূজা হয়, তারপরে শুরু হয় দেবতাদের পূজো। সেই সময় কালে কিন্তু কোনও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয় না। অনেক পরে এই সব যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা শুরু হয়। প্রথম দিকে দেবতাদের পূজো করা হয় ফুলের শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে। কিন্তু এখন তো সেই তোমরা আর পূজার যোগ্য নও। লোকেরা গিয়ে শিবের উপর আকন্দ-ধূতরা ইত্যাদি উৎসর্গ কেন করে ? সেই বিষয়ে বাবা বোঝাচ্ছেন -এতদিন তোমরা সবাই তো কাঁটার মতনই ছিলে। তার মধ্যে থেকেই কেউ সদা-সর্বদার গোলাপ, কেউ সাধারণ গোলাপ, এবং কেউ বা জুঁইফুল সদৃশ্য হতে যাচ্ছো। কেউ বা আবার আকন্দ ফুলও হও। যারা এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনকে সেভাবে মনোযোগী হয়ে ধারণ করে না, তারাই আকন্দ হয়। তারা বিশেষ কোনও কার্যেই লাগে না। কাঁটা হয়ে শ্রদ্ধার্ঘরূপে শিব-বাবার স্মরণে এসে পড়ে। বাবা তাদেরকেও ফুল বানিয়ে দেন। কিন্তু ফুলেরও তো বৈশিষ্ঠের বিভিন্নতা থাকে। যেমন পুষ্প উদ্যানে কত বিভিন্ন প্রকারের ফুলেরই সমাহার থাকে। তার মধ্যেও তো গুনের বিচারে ক্রমিক অনুসারে হয়। কারও স্থান হয় হৃদয় সিংহাসনে, কেউ বা যেন-তেন প্রকারের। এই ধরনের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা একমাত্র বাবাই করতে পারেন, যা আর কারও দ্বারাই সম্ভব নয়। ভক্তি-মার্গের পথ যেমন জটিল, তেমন তার বিস্তারও। কিন্তু সেখানে বিন্দুমাত্র জ্ঞানের ধারণা নেই। সত্যযুগে যেমন কেবল মাত্র দেবী-দেবতারাই থাকেন, তেমনি কলিযুগে এই জগতে একজনও দেবতা থাকেন না। পরমাত্মা নিশ্চয় কখনও মানুষদেরকে দেবতায় পরিণত করেছিলেন। বাবা এসে এমন কর্মই শেখান, মানুষেরা তা শিখে দৈবীগুণ ধারণ করে দেবী-দেবতায় পরিণত হয়। কিন্তু অন্য ধর্মে কি শেখায় ? গুরুদের পথেই চলতে শেখায়, পরে যখন সময় অনুসারে তাদের গুরুরা আসবে, তারপরে তাদের আসতে হবে। তারা (গুরুরা) কেবলমাত্র পবিত্রতার জ্ঞানই দিয়ে থাকে। যীশুখ্রীষ্ট যখন এই দুনিয়াতে আসেন, তখন তো আর খ্রীষ্টান ধর্মের কেউ থাকেন না, ওনার পিছনে পিছনে খ্রীষ্টানরা আসতে থাকে উপর থেকে। বাবা জানাচ্ছেন, মুখ্য ধর্ম ৪-টি। যারা ধর্ম স্থাপন করেন, তাদের শাস্ত্রগুলিকে বলা হয় ধর্মশাস্ত্র। এই প্রকারের ৪-টি প্রধান ধর্ম আছে। এছাড়া বাকী অন্যেরা যারা ছোট ছোট ধর্মের, তারা এরকমেই বৃদ্ধি পেতেই থাকে। ইসলাম ধর্মেরও নিজস্ব শাস্ত্র আছে। বৌদ্ধদেরও সেরূপ আছে। সুতরাং ধর্ম-শাস্ত্রগুলি কেবল সেই ধর্মেরই জন্য। আর ব্রাহ্মণ-ধর্মের তো সূচনা হলো সবে। তার গায়নও করা হয় ব্রাহ্মণ দেবতা নমঃ ..... বলে। অতএব সেই ব্রাহ্মণদেরই বোঝাতে হবে কি, পরমাত্মা এসে যখন ব্রহ্মার শরীরে অবস্থান করে, ব্রহ্মার দ্বারা যখন ব্রহ্মা-মুখ-বংশাবলী বাচ্চাদের রচনা করেন- তারাই হয় প্রকৃত ব্রাহ্মণ। কিন্তু অন্যেরা (যারা নিজেদেরকে সমাজে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে থাকে) তো আর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান আদৌ হতে পারে না। অথচ তারা কেবল নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ বলে জাহির করে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কথার প্রকৃত অর্থটাই জানা নেই তাদের। তারা যখন ব্রহ্মা-ভোজন গ্রহণ করেন, তখন সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা ব্রহ্মা ভোজনের কতই না মহিমা কীর্তন করে। তবে তো এত সব মহিমা ফালতুই হয়ে যায়। তাদের কাছে ব্যাখ্যা চাইতে পারো, কিসের পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা নিজেদের ব্রাহ্মণ ভাবো ? এর জন্য প্রথমেই তো দরকার ব্রহ্মার - পরমাত্মা যার দ্বারা এই সৃষ্টির রচনা করান। অতএব তোমরাই (বি কে রা) প্রকৃত অর্থে ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণদেরই সর্ব্বোচ্চ শিখরে দেখানো হয়। বিরাট বা নানান রূপে দেখানো হয় না ব্রাহ্মণদের। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ তবে আসে কোত্থেকে ? তারাই নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ বলে জাহির করতে পারে যখন পরমাত্মা এসে ব্রহ্মার দ্বারা নতুন রচনা রচেন, কেবল তখনই কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারে। পরে এই ব্রাহ্মণরাই দেবতায় পর্যবেশিত হয়। আর ব্রাহ্মণ হতে পারে কেবল মাত্র এই সঙ্গম সময় কালে। যেমন কলিযুগের সবাই শূদ্র। ব্রাহ্মণদের গুণের মহিমা সবাই উদার ভাবে করে থাকে। বাবা এইসব কথাগুলিকেই বুঝিয়ে বলেন। মোদ্দা কথা হলো আলফ্ আর বে (

আদি=পরমাত্মা আর আত্মা) এছাড়া সবকিছুই তো বিস্তার। ভক্তির ব্যাপারটাকেও এই ভাবেই বোঝাতে হবে। বাবা জানান, তোমরা কেউ-ই তদ্রুপ ভক্ত নও। বাবা কখনও তোমাদের প্রতি রাগ করেন না। কিন্তু উঁনি যখন বাবা, তখন তো তোমাদেরকে এইসব বোঝাতেই হবে -তাই না। কারণ বাচ্চা যদি কোনও অন্যায় করে, তখন বদনাম তবে কার হবে ? -- অবশ্যই শিববাবার। বাচ্চাদের কল্যানার্থে তাই বাবা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যেমন ধরো, কারও যদি কোনও ভুল হয়, তখন ভাববে যে, নাটকের চিত্রপট অনুসারেই তা নির্ধারিত, যার মধ্যে সংশোধনের/কল্যাণের দিশাই রয়েছে। প্রতিটি ঘটনার পিছনেই কল্যাণ থাকে, যেহেতু এই বড় বাচ্চা(ব্রহ্মা) সবারই কল্যাণকারী। এই কল্যাণের উপরেই তো সম্পূর্ণ নাটক রচিত, যার দ্বারা কারও ক্ষতি হয় না। তাই ইনি যদি বলেন, এটা করো, ওটা করো -তা অবশ্যই করা উচিত। আর তাতে যদি ক্ষতিও হয়, ভাববে তার পিছনেও কোনও মঙ্গল অবশ্যই আছে। সুতরাং লোকসানের কোনও ব্যাপারই নেই। প্রতি পদেই কল্যাণ আর কল্যাণ। যদিও অকল্যাণও থাকে নাটকের মধ্যে, যেহেতু ভুল তো সবারই হতে পারে। কিন্তু অবশেষে যে কোনও পরিস্থিতিই হোক, তখন কল্যাণ তো হবেই হবে, যেহেতু বাবা যে কল্যাণকারী। প্রত্যেকেরই কল্যাণ করতে হবে। উঁনি যে সবারই সদ্গতি করে থাকেন। বিনাশের পূর্ব মূহুর্তে, এখন সবারই হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিতে হবে। যেহেতু সবারই উপর অনেক পাপের বোঝা চেপে আছে যে। সেগুলি তো তাদের মেটাতেই হবে। সাজা পেতে আর দেরী নেই। মাত্র সেকেন্ড সময়ের মধ্যেই জীবন-মুক্তি পাওয়া যায়। সেই সেকেন্ড সময়টুকুও কি পাপের সাজা ভুগতে পারবে না ? যেমন কাশী-কলবটেতে গিয়ে দন্ডী কাটতে কাটতে তাদের শরীর ত্যাগ করতে হয়। তাতেও কিন্তু তারা শিববাবার কাছে যেতে পারে না। কারণ তাতে কেবল পুরোনো কর্মফলের হিসেব মেটানো যায়, কিন্তু আবার নতুন করে সবকিছু শুরু হয়। কেউই কিন্তু কল্প-চক্রে মাঝ পথে ফিরে যেতে পারে না। যদিও এই জ্ঞান মাত্র সেকেন্ড মূহুর্তের, কিন্তু সেই জ্ঞানের পাঠ তো রোজই পড়তে হবে। রোজই শিববাবা পরমাত্মা যিনি জ্ঞানের সাগর তিনিই স্বয়ং এসে এই পাঠ পড়ান। কৃষ্ণ তো দেহধারী, ওনার আবার পুনঃজন্মও হয়। কিন্তু শিববাবা তো অজন্মা। যারা পাঠ পড়তে চায় না, তারা অবশ্য করেই এতে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। তাই এই রুদ্র-যজ্ঞে বিঘ্নও আসে। অবলাদের উপর কতই না অত্যাচার হয়। যা কিছুই হচ্ছে, ঠিক একই প্রকারে তা কল্প পূর্বেও হয়েছিল। অসুরেরা তো কত প্রকারেই হাঙ্গামা করতে থাকে। চিত্রগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে, কখনও বা প্রদর্শনীর জিনিষ পত্রেও আগুন লাগাতেও দ্বিধা বোধ করে না। তাতে আর আমরা কি বা করতে পারি । অন্তরে শুধু ভাবি, এ তো ভবিতব্য। জাগতিক নিয়মে পুলিশকে রিপোর্ট তো লেখাতেই হয়। কিন্তু অন্তরে জানে, কল্প পূর্বে যা ঘটেছিলো, তা তো ঘটবেই। এতে দুঃখ পাবার কিছু নেই। ধোপার ঘর থেকে কাপড় হারিয়ে গেলে, লোকসান তো হবেই, কিন্ত তখন নতুন আর একটা তো বানাতেই হয়। বাবা তা বলেই রেখেছেন, যেখানে প্রদর্শনী ইত্যাদি করে থাকো, সে ক্ষেত্রে ৮ দিনের জন্য বীমা করিয়ে নাও। এমনও সহৃদয় ব্যক্তি পেতে পারো, যিনি এর জন্য কোনও মূল্যও নেবে না। আর বীমা না করালেই বা কি আর হবে। আবার ভালো ভালো নতুন চিত্র কেউ বানিয়ে দেবে। প্রতি পদক্ষেপেই যে পদ্মাপদম লাভ হয়। তোমাদের প্রতি পদক্ষেপই, প্রতি সেকেন্ডই খুবই মুল্যবান। যেহেতু তোমরাই পদ্মাপদমপতি হও বাবার বর্সা দ্বারা, পুরো ২১ জন্মের জন্য। তাই তো তোমরাও কত সুন্দর ভাবে অন্যদেরকেও বোঝাতে পারো। সত্যযুগের স্বর্গে তো তোমাদের কাছে কত বিপুল ধন-সম্পত্তি থাকে। গোনা-গুনতিরও ব্যাপার থাকে না। বাবা তোমাদেরকে কত ধনবান আর সুখী বানিয়ে দেন।কত বড় আমদানী এটা। (স্বর্গের) প্রজারাও কত ধনবান হয়। আর এই আমদানী হয় পুরো ২১ জন্মের জন্য। যেহেতু এই

ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনে মানুষ থেকে দেবতা হওয়া যায়। কিন্তু তা পড়ান কে ? -- বাবা। অতএব এমন পাঠে কখনও অবহেলা করা উচিত নয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার !

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সর্বদা স্মৃতিতে যেন থাকে যে, এই কল্যাণকারী যুগে প্রতিটা ব্যাপারেই কল্যাণ রয়েছে। আমাদের কোনও অকল্যাণই হতে পারবে না। সর্ব কিছুতেই কল্যাণ আছে এই বোধে সর্বদাই নিশ্চন্তে থাকতে হবে।

২) সর্বদাই যেন পছন্দের গোলাপ ফুলের মতন থাকতে পারো, সেই নিমিত্তে পঠন-পাঠনের প্রতি সম্পূর্ণভাবে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ঈশ্বরীয় পাঠে গাফিলতি করা চলবে না। অনাদরের আকন্দ ফুলের মতন যেন হয়ো না।

বরদান :- সমস্যাকেও চড়তী-কলার সাধন অনুভব করে, সর্বদা সন্তুষ্ট থেকে শক্তিশালী হও।

যে শক্তিশালী আত্মা হবে, সে সমস্যাকে এইভাবে উতরে যাবে যেন কোনও সরল রাস্তাকে অতি সহজেই অতিক্রম করছে।তখন সমস্যা তার জন্য চড়তী-কলার সাধন হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিটা সমস্যাই যেন তার খুবই পরিচিত এমনই অনুভব হয়। কোনও কিছুই তার কাছে আশ্চর্য মনে হয় না। উপরন্তু সর্বদা সন্তুষ্টই থাকে। মুখ থেকে কখনও অপরাধ-মূলক শব্দ যেন না বেরোয়, আর তারা যেন এমনই সক্ষম হন তক্ষুনি যেন সেই কারণকে নিবারণে বদলে দিতে পারে।

স্লোগান :- স্ব-স্থিতিতে স্থিত থেকে সর্বপ্রকারের পরিস্থিতিতেই উতরে যাওয়াই শ্রেষ্ঠতার পরিচয়।